নিরাপদ এবং দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলের গুরুত্ব

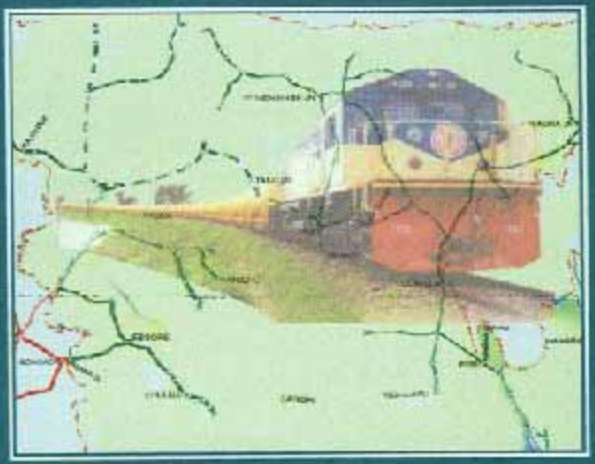

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
ওয়ার্ল্ড ফর এ বেটার বাংলাদেশ

দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ
যোগাযোগ ব্যবস্থায়
রেওয়ের গুরুত্ব

প্রতিবেদন
অমিত রঞ্জন দে
মোঃ জাফর ইকবাল
নাজমুল করিম সবুজ

সম্পাদনা
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রকাশক
ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
ঢাকা, ১ অক্টোবর ২০০৬

IqvK di G †eUvi evsjv‡`k
বাড়ি নং# ৪৯, সড়ক নং# ৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯.
ফোন: ৯৬৬৯৭৮১, ৮৬২৯২৭৩, ফ্যাক্স: ৮৬২৯২৭১
info@wbbtrust.org, www.wbbtrust.org

কৃতজ্ঞতা

`xN¯vqx Ges wbivc` thvMv‡hvM e¨e¯vq †i‡ji ¸i“Z

fwgKv

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা দীর্ঘস্থায়ী এবং নিরাপদ যাতায়াতের ক্ষেত্রে রেলের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশ বান্ধব, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে রেল একটি জনপ্রিয় পরিবহন। আমাদের সীমিত সম্পদ, জনসংখ্যার আধিক্য, নিম্ন আয় ও কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় রেলের গুরুত্ব ব্যাপক। যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, পণ্য পরিবহনে, অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের ব্যাপক প্রসার এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে রেলকে জনপ্রিয় করে তোলা অত্যন্ত জরুরী।

M‡elYvi D‡Ïk¨

বাংলাদেশের রেলপথের সুবিধা, বর্তমান সমস্যার গভীরতা এবং সম্ভাবনার একটি কার্যকর কারণ অনুসন্ধান। রেলের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ভিতর দিয়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে একটি কার্যকর যোগাযোগের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা। এছাড়া

১. রেল পথকে সড়ক পথের চেয়ে জনপ্রিয় করা
২. রেল ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে যাতায়াত দুর্ঘটনা শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে আনা
৩. জ্বালানীর ব্যবহার কমানো
৪. সর্বোপরি পরিবেশ বান্ধব দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা

M‡elYv c×wZ

আলোচ্য গবেষণায় বিষয়ের প্রকৃতি ও বিষয়ের গভীরতা বিবেচনায় মূলত দুই ধরনের পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (content analysis) এবং গুণগত (Qualitative) তথ্যের বিষয়গত অধ্যায়ন (case study) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion-FGD)'র আশ্রয় নেয়া হয়েছে। গবেষণায় সমস্যার বিস্তার ও জটিলতার বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রাসঙ্গিক তথ্য ও মাধ্যমিক তথ্যের সহযোগিতার পাশাপাশি একাধিক সংখ্যক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

DcvË msMn

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং প্রকাশিত বই-জার্নাল সমূহের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। যেটি মূলত সমস্যার গতি-প্রকৃতি বুঝতে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রাসঙ্গিক উপাত্ত পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে সমস্যার বিভিন্ন দিক ও তীব্রতা এর ফলাফল এবং একটি কার্যকর সমাধানের জন্য সরেজমিনে রেল পরিদর্শন, একান্ত সাক্ষাৎকার বিশেষ করে রেলওয়ের নিয়মিত যাত্রী ও কর্মকর্তাদের মূল্যবান মতামত, আখাউড়া, ঈশ্বরদী, কমলাপুর এবং পোড়াদহ রেল ষ্টেশনে পরিচালিত ৪টি ফোকাস গ্রুপের আলোচনা গবেষণা পত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচকদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গবেষণাপত্রে উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সুপারিশমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

M‡elYvi †c¶vcU

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদী পথের গুরুত্ব থাকলেও কালক্রমে রেলপথের আর্বিভাব গোটা উপমহাদেশে ঘটিয়েছে অভাবিত উন্নয়ন। রেল ব্যবস্থাকে ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রে বলা হয় আধুনিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

শিল্পায়ন, নগরায়ন, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও এ দেশের আর্থ-সামাজিক অচলায়তনের ধারা ভেঙ্গে পুঁজি ও শিল্প নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে রেলওয়ে পালন করেছে অভূতপূর্ব ভূমিকা। অর্থাৎ পুরো সমাজ জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে রেলপথের সুবাদেই। সেই ধারাবাহিকতায়ই ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা জগতী সেকশনে ৫৩ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের এ অঞ্চলে রেলের গোড়া পত্তন। শুরু থেকেই রেল এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ণে পালন করছে যুগান্তকারী ভূমিকা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দু'শ বছরের শাসন কাল থেকে যোগযোগ মাধ্যম হিসেবে রেলপথ ছিলো কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। এরই মাঝে ঘটেছে শিল্পায়ন, নগরায়ন, বেড়েছে জনসংখ্যা। তার সাথে সঙ্গতি রেখে বেড়েছে জনগণের চাহিদা, সড়ক পথের ঘটেছে অভূতপূর্ব বিস্তার। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমাদের শহর জীবন হয়েছে জনাকীর্ণ, অতি যান্ত্রিকতায় পূর্ণ এবং এখানে জনসংখ্যা বেড়েছে অতি মাত্রায়। ফলে সড়ক পথের উপর পড়ছে অতিরিক্ত চাপ, প্রাইভেট গাড়ীর আধিক্যও কম নয়। এ অবস্থা অবলোকন করে ব্রিটেনের প্রখ্যাত এক সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন-'So many car, So many poor.' গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে ঠিক কিন্তু দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে তালে তাল মিলিয়ে।

এ দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ বাস করে দারিদ্রসীমার নীচে। যাদের অধিকাংশের কাছে স্কাইরেল, পাতালরেল, ম্যাগনেটিভ ট্রেন দুঃস্বপ্ন। এই দরিদ্র মানুষগুলোর যোগাযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। অন্যদিকে আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতায় চলছে জ্বালানী সংকট। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে জ্বালানী একটি বড় সমস্যা এবং তা শুধুমাত্র বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতেও প্রভাব বিস্তার করবে। দেশের জ্বালানীর একটা বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে সড়ক পথে চালিত পরিবহনে। উপরন্তু অতিরিক্ত পরিবহন ব্যবহারের কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। যা শস্য উৎপাদনে ফেলছে নেতিবাচক প্রভাব।

খাদ্যঘাটতি মোকাবেলায় ভূমির পরিমিত ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। দেশে প্রতিবছর ৮০ হেক্টর কৃষি জমি কমছে। পরিকল্পনাহীন সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ এর অন্যতম কারণ। অতি মাত্রায় সড়ক পথের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটছে অগণিত প্রাণহানী, যা একদিকে মানব সম্পদের অপচয় এবং হৃদয় বিদারকও বটে। অন্য দিকে রেলে তুলনামূলকহারে দূর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম এবং মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে দেশের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বর্পূ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের অনেক দেশে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রেলকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বাহন হিসেবে সম্প্রসারণ করছে। সেই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিবেশ, যানজট সমস্যা, নিরাপত্তা, ভূমির পরিমিত ব্যবহার, জ্বালানী সমস্যা ও বেশি পরিমাণ পণ্য পরিবহনের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে আলোচ্য গবেষণাটি প্রাসঙ্গিকতার দাবী রাখে।

M‡elYvi mxgve×Zv

যে অনুকল্পের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালিত এবং যে সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে সেটি পদ্ধতিগত দিক থেকে আরো ব্যাপক, সময়সাপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কারণ এরকম একটি জাতীয় সমস্যা নিয়ে আরো ব্যাপক পরিসরে গবেষণা হওয়া উচিত। উপরন্তু রেলওয়ে ব্যবস্থার সার্বিক বিষয়টি পুরোপুরি সুক্ষাতিসুক্ষ বিশ্লেষণপূর্বক কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়ের গভীরতা একটি সময় সাপেক্ষ, গভীর অনুসন্ধান, দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর অসঙ্গতিসমূহের কার্যকারণ সম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ অনুধাবন প্রয়োজন যা আলোচ্য গবেষণায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করার চেষ্টা করা হলেও পুরোপুরি করা সম্ভব হয়নি। তথাপিও একথা নি:সন্দেহে বলা চলে যে দেশের বিদ্যমান যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি রূপরেখা এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় ও সেই সাথে রেল ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা যে কত জরুরী সেটি বোঝার ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণা একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য গবেষণাটি প্রথাগত গবেষণা থেকে একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত। ডাব্লিউবিবি মনে করে শুধু গবেষণার জন্য গবেষণা নয়; গবেষণাকে বাস্তবে রূপদান করাই গবেষণার আসল উদ্দেশ্য। সেই চিন্তাকে সামনে রেখেই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাচীন এই যোগাযোগ মাধ্যমটিকে ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠী, শিল্পায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায়/ বাঁচানো যায় সেই লক্ষ্যে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ প্রত্যেকের নিজস্ব অবস্থান থেকে কাজ করা অত্যন্ত জরুরী এবং এই দাবীর পক্ষে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমর্থন তৈরি আজকের সময়ের প্রথম দাবী। সেই ধারাবাহিকতায় বিশেষজ্ঞের মতামত, নাগরিক সমাজের পরামর্শ এবং রেলওয়ে যাত্রীদের সাথে সাক্ষাতে যেসব কর্মকৌশল উঠে এসেছে সেগুলো তুলে ধরা হলো।

evsjv‡`k †ijI‡qi Ae¯’v

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে সড়ক পথের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু রেলওয়ের মাধ্যমে একসাথে বেশি পরিমান মালামাল পরিবহনের সুবিধা, যানজট সমস্যা না থাকায়, ভূমির পরিমিত ব্যবহার, জ্বালানী খরচ সাশ্রয়, নিরাপদ যাতায়াত এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিবেশ দূষণ করার কারণে পৃথিবী জুড়ে সকল দেশেই রেলকে আবার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়া শুরু হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এই খাতটি এখনও পর্যন্ত চরম অবহেলার মধ্যে রয়েছে।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের শেষে এদেশে কেবলমাত্র ৬০০ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা ছিল। তা বেড়ে এখন প্রায় ৪৯,৫০০ কিঃমিঃ হয়েছে যার মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ১৩,০০০ কিলোমিটার এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের ৩৬,৫০০ কিলোমিটার। অন্যদিকে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ১৯৪৭ সালের ২,৮০০ কিলোমিটার থেকে ২,৭০০ কিলোমিটারে নেমে গিয়েছিল।

সম্প্রতি পার্বতীপুর হতে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা ও বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পর্যন্ত এবং যমুনা সেতু রেল লিংক প্রকল্পের আওতায় জামতৈল হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের ফলে বর্তমানে রেলপথের দৈর্ঘ্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮৪৮ কিলোমিটার হয়েছে।

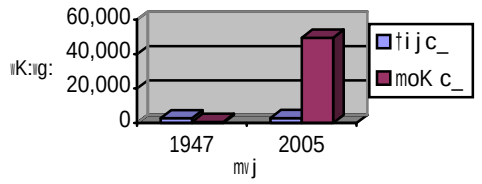

উল্লেখ্য যে, রেলওয়েকে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণ, রোলিং স্টক সংগ্রহ ও সকল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ নিজেকেই করতে হয়। অন্যদিকে, সড়ক ব্যবহারকারীগণকে সড়ক নির্মাণ বা মেরামত খাতে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। উপরন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগের ওপর Cost Recovery হচ্ছে রোডের জন্য টাকা প্রতি ৩৫ পয়সা এবং রেলওয়ের জন্য টাকা প্রতি ৬৫ পয়সা। এধরনের অবহেলা এবং অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে রেলওয়ে টিকে আছে এবং দেশের মানুষকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

cwienb †¶‡Î

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে অন্যতম প্রধান পরিবহণ রেল। রেল এর সাহায্যে ধান, গম, চাউল, পাট, তামাক, আখ ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য এবং সার-কীটনাশক, কৃষি সরঞ্জাম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করা হয়। তাছাড়া এতে করে পরিবহন করা হয় শিল্পজাত পণ্য এবং নদী বন্দরের সাহায্যে যে সমস্ত পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করা হয় তারও একটা অংশ রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট, বোল্ডার, সিমেন্ট, কন্টেইনার ট্রাফিক ইত্যাদি। কম খরচে বেশি দুরত্বে পণ্য ও যাত্রী বহনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভাল পরিবহন আর নেই। কিন্তু মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কন্টেইনার সুবিধা না থাকায় এবং ট্রিপ কম থাকায় বন্দরে আসা মালামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রেনের সাহায্যে বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে মাত্র ১১% কন্টেইনার রেলওয়ের মাধ্যমে বহন করা সম্ভব হয়। ধারণা করা হয় যদি ২০% কন্টেইনার রেলওয়ের মাধ্যমে বহন করা যায় তাহলে রেল খাতে কোন লোকসান থাকবে না।

রেলওয়ের এই ধরনের সীমাবদ্ধতার মাঝেও বাংলাদেশ রেলওয়ে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকা অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো(আইসিডি) পর্যন্ত কন্টেইনার পরিবহন করা হয়। বর্তমান সময়ে একদিকে ৩টি করে ৬টি কন্টেইনার ট্রেন ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে চলাচল করে। ৪০ ফুট কন্টেইনার পরিবহনের জন্য রেলওয়ের নিজস্ব কারখানায় মডিফাইকৃত ৩৫টি, চীন হতে আমদানীকৃত ৮০টি ও ভারত থেকে আমদানীকৃত ৯৯টি কন্টেইনার ফ্লাট আছে। বিগত ৫ বছরে কন্টেইনার ট্রাফিক পরিবহন ও তা থেকে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ-

অর্থবছর	কন্টেইনার সংখ্যা(টিইইউ)	আয়(কোটি টাকা)
২০০০-০১	৫২,৭৩৭	২৯.৪০
২০০১-০২	৫৮,৩০১	৩২.৬২
২০০২-০৩	৬১,০২৬	৩২.০০
২০০৩-০৪	৭০,২৪৭	৩৭.৩৪
২০০৪-০৫	৭১,৯৮১	৩৯.০৯

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তাহল, দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বল্প আয়ের। এই স্বল্প আয়ের মানুষগুলোর যাতায়াত সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে অর্থের মাপ কাঠি এবং সুবিধা প্রদানের বিচারে তিন ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা। এখানে যারা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত এবং আর্থিকভাবে যারা অনেক বেশি স্বচ্ছল তারা যাতায়াত করে থাকেন। প্রথম শ্রেণী এখানেও যারা অপেক্ষাকৃত আরামে বা একটু পয়সা বেশি দিয়ে স্বাচ্ছন্দে যেতে চান তারা যাতায়াত করে থাকেন। অপরটি দ্বিতীয় শ্রেণী। এই কামরায় সাধারণত কম পয়সাওয়ালা অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর যাত্রীরা যাতায়াত করে থাকেন।

আমরা যদি বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী পরিবহনের চিত্রটি অবলোকন করি তাহলে দেখতে পাব এই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ রেলে বেশি যাতায়াত করে থাকে। রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী ৯৮.৬% যাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ১.৩৬% প্রথম শ্রেণীতে এবং ০.০৫% যাত্রী শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় যাতায়াত করে থাকে। এর প্রধানতম কারণ রেলওয়ে খুব স্বল্প খরচে যাতায়াত সুবিধা প্রদান করে থাকে।

evsjv‡`k ‡ij I‡qi hvÎx cwien‡bi wPÎ

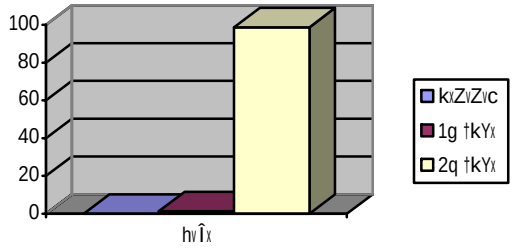

Rvjvbx, A_bxwZ I cwi‡ek

সমগ্র বিশ্বব্যাপি জ্বালানী সংকট ক্রমান্বয়ে ঘণীভূত হয়ে আসছে। জ্বালানীর যে পরিমান মজুদ আছে তা আগামী ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের মানুষের চাহিদা মেটাতে পারবে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। বাংলাদেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে তা আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত দেশের চাহিদা মেটাতে পারে। এমনিতেই আমরা জ্বালানীর জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল। গ্যাস সম্পদ শেষ হওয়ার পর এই নির্ভরশীলতা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে।

জ্বালানীর মজুদ কমার সাথে সাথে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর টিকে থাকা দুষ্কর। সুতরাং জ্বালানীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নজর দেওয়া খুবই জরুরী।

পরিবেশ বান্ধব, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও নিরাপদ পরিবহন মাধ্যম হিসেবে এবং টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নে রেলওয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় পরিবহন মাধ্যম। রেলওয়ের মাধ্যমে একসাথে অনেক যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা যায়। ফলে পরিবেশ দূষণ, জ্বালানী খরচ ও ভূমির ব্যবহার কম হয়।

একটি মিটার গেজ মালবাহী ট্রেন ২১০টি ৫ টনি ট্রাকের সমপরিমাণ মালামাল পরিবহন করতে পারে।একই পরিমাণ ট্রাফিক ইউনিট পরিবহনে রেলপথ ও সড়ক পথের মধ্যে যদি তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ট্রেনের চেয়ে কার ৮.৩ গুণ এবং ট্রাক ৩০ গুণ পরিবেশ দূষণ করছে। অন্যদিকে জ্বালানীর বিষয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রেলপথের চেয়ে কার ৩.৫ এবং ট্রাক ৮.৭ গুণ বেশী জ্বালানী খরচ করছে।

moK c_ I †ijc‡_ ZjbvgjKfv‡e
Rvjvbx LiP I cwi‡ek `lY Gi wPÎ

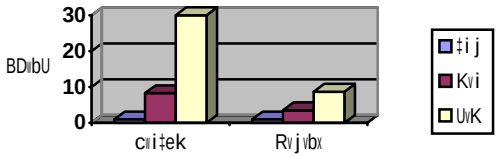

আমরা যদি যাত্রীর আর্থিক সাশ্রয়ের দিকটি বিবেচনায় নেই তাহলেও দেখা যাবে যে একজন যাত্রীর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যেতে রেলওয়েতে (চেয়ারকোচ) ১৫০ টাকা, সমমানে বাসে ২২০ টাকা এবং এসি বাসে যেতে লাগে ৪২৫ টাকা। ঢাকা থেকে নারায়নগঞ্জ রেল এর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যেতে খরচ হয় মাত্র পাঁচ টাকা। সেখানে বাসে নন এসি ১৬ টাকা এবং এসি বাসে যেতে লাগে ২৫ টাকা। সুতরাং দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ সবার আগে রেল এর মাধ্যমে যাতায়াতের কথা চিন্তা করে থাকে।

XvKv t_‡K PÆMvg evmfvovi Zjbvgj K wPÎ

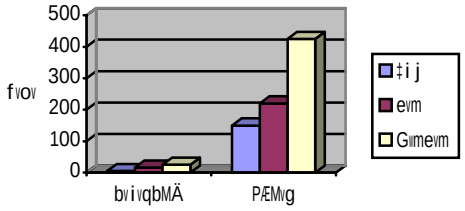

দেশের একটা বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী কর্মহীন অবস্থায় রয়েছে। এদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে রেল পরিচালন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এর রক্ষণাবেক্ষণের সাথে যেমন অনেকগুলো মানুষ যুক্ত থাকে তেমনি এর যে সমস্ত স্টপেজগুলো আছে তার আশেপাশের এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে বাজার। যেখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। আবার দেশীয় শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রেও রেলওয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে তাকায় তাহলে দেখতে পাব তাদের কলকারখানা থেকে শুরু করে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে রেল স্টেশনগুলোকে কেন্দ্র করে। আজকে আমাদের দেশেও যে সমস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প গড়ে উঠেছে তার বিকাশ ঘটাতে হলে রেলওয়েকে আরো বেশি শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের জনগনের পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে এই খাতটিকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন ছিল তা দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রেলওয়ের ২৯৯টি সেতু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ফলে রেলওয়ে ৩০০ টুকরো হয়ে যায়। এই ব্যাপক ক্ষতি কাটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল আলাদাভাবে বিনিয়োগ করা। কিন্তু তা না করে বরং Cost recovery করা হয়েছে সড়ক পথের প্রায় দ্বিগুন হারে। পাশাপাশি দেশের সড়ক ব্যবস্থা এবং রেলওয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের তুলনামূলক চিত্রটিও দেখা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর পরিবহন খাতে বরাদ্দ বাজেটের তালিকা

কততম পরিকল্পনা	সাল	শতাংশ	মোট পরিবহন খাতে বরাদ্দ	রেলওয়ে খাতে বরাদ্দ (মি. টা.)
১ম পঞ্চবার্ষিকী	১৯৭৩-৭৮	২৩.৯০	৫,২৭৬.১০	১,২৬১.৩০
১ম দ্বি-বার্ষিকী	১৯৭৮-৮০	২৭.৩৫	৪,৫০০.০০	১,২৩০.৮০
২য় পঞ্চবার্ষিকী	১৯৮০-৮৫	৩২.১৩	১২,৮৬৪.৬০	৪,১৩৩.৯০
৩য় পঞ্চবার্ষিকী	১৯৮৫-৯০	২৭.০০	৩০,০২৩.০০	৮,৩৬০.০০
৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী	১৯৯০-৯৫	১৩.১০	৬৩,৭৩০.০০	৮,৩৫০.০০
২য় দ্বি-বার্ষিকী	১৯৯৫-৯৭	০৮.০০	৪৫,৪৭৯.০০	৩,৯৮৬.৭০
৫ম পঞ্চবার্ষিকী	১৯৯৭-২০০২	২০.৩৩	১,১৮,০০০.০০	২৪,০০০.০০

উপরের চিত্রে পরিবহন খাতে বরাদ্দ বাজেটের তুলনামূলক চিত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীনতার পর থেকে বিগত বছরগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রেলওয়েকে শুধু অবহেলা করা হয়েছে।

‡RvQbv-weaev gwnjv
¶` e¨emvqx

হাসনা, অরুনা, জোছনা, সুরমা এবং মিনতি দেবী এরা সকলেই তালাক প্রাপ্তা মহিলা। স্বামী ছেড়ে চলে গেছে। জীবিকার তাগিদে তারা বেছে নিয়েছে ব্যবসা। এরা সকলেই ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বাজার থেকে মিষ্টি আলু, চাল, পেয়াজ কিনে গ্রামে বিক্রি করে। যা আয় হয় তাই দিয়েই সংসার চলে।

ভৈরব আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া তাদের যাতায়াত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে মেইল ট্রেন। ট্রেনের অভিজ্ঞতা তাদের ১০/১৫ বছর। জোছনা জানালেন "সকাল আটটার সময় বাড়ি থেকে বের হয় আর ফিরে যায় রাত ১০ টায়। কোন টিকেট লাগে না পুলিশ ও নিরাপত্তা প্রহরীদের ২ টাকা, ৫ টাকা দিলেই ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে তারা খুব গালিগালাজ করে। এত কিছুর পরও সুবিধা হলো বাসে যাতায়াতে খরচ বেশি পড়ে, বাসের ড্রাইভাররা আমাদের নিতে চায় না। মালের আলাদা ভাড়া কাটে। মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষের সাথে ঠেলাঠেলি করে যেতে হয়। আর বাসে গেলে আমাদের কোন লাভ থাকে না।

ট্রেন আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। কোন রকম আয় রোজগার করে খেতে পারি।সমস্যা হলো সময় খুবই বেশি লাগে। কারণ কন্ট্রোলাররা সহজে ট্রেন ছাড়তে চায় না। শুনছি মেইল ট্রেন নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার নাকি বন্ধ করে দেবে। এটা হলে আমরা না খেয়ে মারা যাবো। আমরা ট্রেনটা আছে বলেই বেঁচে থাকতে পারছি।"

¯^"Q›`gq I wbivc` cwienb

সড়কপথে যাতায়াতের চেয়ে রেলপথে যাতায়াত অনেক বেশি আরামদায়ক। রেলওয়েতে যাত্রীরা অনেক আরামে বসে যেতে পারেন এবং এর কামরাগুলোতে যে সিট রয়েছে সেখানে দু সারীর মধ্যে অনেক জায়গা থাকায় যারা দাড়িয়ে যান তাঁরাও স্বাচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। সিটে বসে প্রয়োজনে ঘুমাতে বা পড়ালেখা করতে পারেন।

ট্রেন লাইনে সাধারণতঃ কোন যানজট থাকে না। সুতরাং নির্ধারিত সময়ে পৌছানো যায়। কিন্তু আমাদের দেশে সড়ক পথে অধিকাংশ সময় যানজট লেগে থাকে। যে কারণে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমরা যদি ঢাকা থেকে নারায়নগঞ্জ যেতে চাই তাহলে দেখা যাবে ট্রেনে যেতে ১ ঘন্টা সময় লাগবে। পক্ষান্তরে বাসে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় লাগার কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যানজটের কারণে দেড় থেকে দুই ঘন্টা লেগে যায়।

ট্রেন একটি আরামদায়ক পরিবহন ব্যবস্থা। এর লাইনগুলো সাধারণত মসৃণ। যেকারণে যাতায়াতে ঝাঁকি কম লাগে। একটি ষ্টেশনে এসে নির্দিষ্ট পরিমান সময় অপেক্ষা করে যাত্রী এবং মালামাল উঠানামা করার জন্য। যে কারণে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, শিশু, মহিলাসহ সর্বস্তরের মানুষ নির্বিঘ্নে যাতয়াত করতে পারে। অন্যদিকে বাসগুলো স্টপেজে স্থিরভাবে দাঁড়ায় না। সেকারণে গাড়িতে উঠা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশ ট্রান্সপোর্ট অথরিটির রোড সেফটি সেল এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০০৩ সালের দুর্ঘটনারতথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০৩ সালে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে ৫২৪ বার। এই দুর্ঘটনায় ২৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন, ১৪৪ জন আহত হয়েছে এবং এই দুর্ঘটনায় মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ২২৪ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৩৯১২ টি। সেখানে মৃত্যু বরণ করেছে ২৭৫২ জন, আহত

হয়েছে ১১৬০ জন এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়িয়েছে ৪,৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ঘটনার পরিমাণ ৮,০০০, মৃত্যুর পরিমাণ ১০,০০০ এবং আহতের পরিমাণ প্রায় ২৫,০০০। সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেড়ে যাবে।

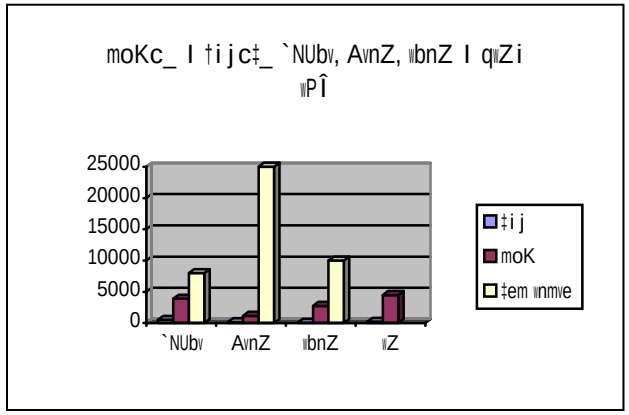

ট্রেন যোগাযোগে দুর্ঘটনা, মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম। সুতরাং জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নেও ট্রেন যোগাযোগে গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। কারণ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মানেই কিছু স্বপ্নের মৃত্যু ঘটা।

‡g‡q‡`i Rb¨ †ij A‡bK mweavRbK

পিংকি খন্দকার

পিংকি খন্দকার, গৃহীনী পড়ালেখা করেছেন বিএ পর্যন্ত। তিনি গিয়েছিলেন সিলেট শাহজালালের মাজারে। মাজার থেকে ফিরে আসছেন ঢাকায়। ঢাকা শহরে নিজের বাসা আছে, ঢাকাতে পড়ালেখা, শৈশব-কৈশোর এবং যৌবন। মাঝে মাঝে ভ্রমণে বের হলে ট্রেনেই সাধারণত ভ্রমণ করে থাকেন। তার এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন-

“মানুষ এখন সকলেই বাসে চড়ে। বাসে সুবিধাও আছে। যেমন বাসে সিলেট-ঢাকা ভ্রমণ করলে বাসের লোকজন খোজ খরব নেয়, সময় কম লাগে। তবে আমি ট্রেনে যাতায়াত করি কারণ দূর্ঘটনা কম, জীবনের নিরাপত্তা আছে। আমি মনে করি মেয়েদের জন্য রেল অনেক সুবিধাজনক। এখানে বাথরুম আছে, সিটে আরামে অনেক জায়গা নিয়ে বসতে পারি। আত্নীয় স্বজন এক সাথে বসে দীর্ঘ রাস্তা যেতে পারি। যা বাসে কল্পনাই করা যায় না।

ঢাকা শহরের আমার বাসের অভিজ্ঞতা ভাল নয়। ঠেলাঠেলি, গাদাগাদি করে বাসে উঠতে হয়। কিন্তু রেলে আমি কখনোই এই অসুবিধা বোধ করি না। শুধু মেয়েদের কারণে নয় বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত দেশে কৃষি জমির উপর চাপ কমাতে, জ্বালানী তেলের উপর খরচ কমাতে অবশ্যই রেলপথের গুরুত্ব দেয় উচিত। সড়ক পথের উন্নয়নে যেভাবে কাজ করা হচ্ছে রেলপথের উন্নয়নে সেটা করা হচ্ছে না। রেল পথের উন্নয়ণেও কাজ করা উচিত।

তবে রেলপথে স্টপেজ কমাতে হবে। বাজেটে রেল পথে বেশি বরাদ্দ দিতে হবে এই কারণে যে, এটি জনগণের বাহন। সরকার সুনজর দিলেই এ পথটিকে আরো উন্নত করা সম্ভব এবং দেশের ও জনগণের স্বার্থেই তা করা উচিত।

iv‡óªxq fwgKvi c‡k †ijI‡q

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। একে লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি এর সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ব্যয় হচ্ছে তা পূরণ করে এটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যেমন জরুরী ঠিক তেমনিভাবে দেশের মানুষের যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরী। যা একটি রাষ্ট্রের জনগণের সাংবিধানিক অধিকার।

পরিবহনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কিছু সামাজিক দায়-দায়িত্বও পালন করতে হয়। যা রেলওয়ে ছাড়া আর কোন মাধ্যমে এত সহজে করা সম্ভব নয়। যেমন রেলওয়েকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্য এবং যাত্রীকে অতি স্বল্প মূল্যে পরিবহনে সাহায্য করতে হয়। অনেক সময় লাভজনক নয় এমন লাইন চালু রাখতে হয় দেশের জনগণের যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, সাইক্লোনসহ যে কোন দুর্যোগ কবলিত এলাকার মানুষদের সাহায্যার্থে ত্রাণ ও পুণর্বাসন সামগ্রী নামমাত্র মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। কখনো কখনো বিনামূল্যেও সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় সামরিক বাহিনীর মালামাল সাধারণ মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে আনা নেওয়া করা। যে সুবিধা অন্য কোন মাধ্যম থেকে পেতে হলে আরো অনেক বেশি অর্থ লগ্নি করা প্রয়োজন হবে। তারপরও রেলওয়ের মত সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে না।

রেলওয়ে দেশের সেবাখাত গুলোতে যে সুবিধা প্রদান করছে তার যদি একটি আর্থিক মূল্যায়ণ আমরা দাড় করাই তাহলে দেখা যাবে যে রেল কোনদিনই অলাভজনক কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। রেলের একটি কামরায় অনেক মানুষ যাতায়াত করতে পারে। এখানে পরিবারের সবাই মিলে একসাথে একটি আন্তরিক পরিবেশে যাতায়াত করা যায়। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষও একই কামরায় থাকে। তাদের মধ্যে ভাব বিনিময় হয়, আদান প্রদান হয় সংস্কৃতির। গড়ে উঠে পারস্পরিক সখ্যতা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা বোধ। যা একটি মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতী গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং দেশের জনগণের স্বার্থে এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই রেলওয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

†Km÷vWx

‡ij I‡q RbM‡Yi evnb
পেটি ব্যবসায়ী

ইসমাইল আহমেদ পেশায় ব্যবসায়ী। শ্রীমঙ্গলে জুতা, কসমেটিকসের ব্যবসা আছে। তিনি প্রতিমাসে দুবার ঢাকায় আসেন ব্যবসার স্বার্থেই। কথা হচ্ছিল তাঁর সাথে। তিনি জানালেন-"রেল নিরাপদ বাহন, মালামাল বহনের ক্ষেত্রে সস্তায় বহন করতে পারি। রেলওয়ে পরিবহনটি এদেশের জনগণের। কিন্তু দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থাপনার কারণে আজকে রেলওয়ে মৃত প্রায়।

রেলওয়ের সমস্যা অনেক, একদিকে সময় বেশি লাগে, সাটার লাগে না, " বাথরুম অপরিষ্কার, সিটগুলো ময়লা, ছেড়া, ফাটা, জানালা নাই, পরিবেশ নোংরা। এসব হয়েছে দীর্ঘ দিনের অবহেলার কারণে, বড় বড় কর্তারা দুর্নীতি লুটপাট করে এর ব্যবসা নষ্ট করে দিচ্ছে। তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করে না, টিকেট চেক করে না, কোথায় কি প্রয়োজন সেসব খেয়াল রাখে না। ফলে জনগণের এই বাহনটি ক্রমশ অ-জনপ্রিয় একটি বাহনে পরিণত হচ্ছে। দুর্নীতি কমাতে হবে, ব্যবস্থাপনা ভাল করতে হবে, ট্রেনের সংখ্যা ও ইঞ্জিন বাড়াতে হবে, সময়মত ট্রেন ছাড়তে এবং ষ্টেশনে পৌঁছাতে হবে। সর্বোপরি পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে ট্রেনকে উন্নত করতে হবে। যদি এটি করা যায় তাহলে ট্রেনই হবে যোগাযোগের সবচেয়ে উন্নত বাহন।"

†U‡bi BwÄb I ewMi ¯íZv
Gg G gvbvb (G¨vW‡fv‡KU)

মান্নান একজন রেলওয়ে কর্মচারী, রেলওয়েতে চাকুরী করছেন ২৫ বছর যাবৎ। মূলত তাঁর পূর্ব রেলে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। লেখাপড়া বেশিদূর করেননি। তবুও তিনি এই বিভাগে চাকুরীর সুবাদে খুব কাছে থেকেই দেখেছেন এর সমস্যা ও সম্ভাবনার অনেক কিছুই। তিনি জানালেন সড়ক পথ যেভাবে উন্নত হয়েছে সেই পরিমাণে নজর দেয়া হয়নি রেল পথে। সড়ক পথ ভাল হওয়ার কারণে যাত্রীরা সড়ক পথে চলাচল করলেও এটা ঠিক যে রেলপথ অনেক নিরাপদ এবং আরামদায়ক। যে কারণে রেলপথে বেশ যাত্রী আসা যাওয়া করে। তবে সেটা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। এর কারণ লুজ টাইম (loss time), রেলওয়ের ব্যবস্থাপনার অভাব।

রেলওয়ের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা যেমন; কম্পার্টমেন্ট জোড়াতালি দিয়ে চলছে, রেলের পর্যাপ্ত ইঞ্জিন নাই। কোনো কম্পার্টমেন্ট ম্যানেজ হলে সেটি চালু করতে প্রায় ২ ঘন্টা সময় লাগে। রেলওয়ের আন্ত:বিভাগের সমন্বয় নেই। ঠিকভাবে সিগন্যালের কাজ হয় তো লাইনের কাজ হয় না। বগির সংখ্যা কম। এটি বাড়ানোর কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। ১৯৮৫ সালে আন্ত :নগর ট্রেন চালু হয়। এরপর এর সংখ্যা আর বাড়ানো হয়নি। ফলে স্বল্পসংখ্যক বগি ও ট্রেন দিয়েই সমস্ত রুট কভার করতে হয়। একই ইঞ্জিন বেশি ব্যবহারের কারণে এর কার্যকারিতা কমে যাচ্ছে।

বগির স্বল্পতার কারণে একই বগি বিভিন্ন রুটে বেশি বেশি লোড নিচ্ছে। নিয়মানুযায়ী প্রতি ১ বছর পর প্রতি ট্রেন ওয়ার্কশপে যাওয়ার কথা কিন্তু আমাদের সেটা সম্ভব হয় না। কারণ ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগির স্বল্পতা। উপরন্তু ট্রেনে ঝাড়ুদার, পানি দেয়া ও মোছার জন্য আগে সরকারী লোক ছিল। কিন্তু ২০০2 সালে এই দায়িত্ব বেসরকারী কোম্পানীকে দেয়া হয়েছে। তারা যথাযথভাবে কাজ করে না। ফলে ট্রেনের বগিগুলো অধিকাংশ সময় অপরিষ্কার থাকে।

রেলওয়ে সরকারী সেবাখাত, জনগণের যোগাযোগ সুবিধার জন্য এর চেয়ে ভাল বাহন আর কিছু হতে পারে না। সরকার এ ব্যাপারে নজর দিলেই এই বাহনটি আরো উন্নত করা সম্ভব হবে।

Wvej jvBb bv _vKvq mgq †ewk jvM‡Q
Avãi gv‡jK (QÙbvg)
‡Ub cwiPvjK

আব্দুর মালেক ট্রেনে চাকরি করছেন প্রায় ৪০ বছর। এই চল্লিশ বছরে তার রয়েছে রেলওয়ের নানা খুঁঠিনাটি অভিজ্ঞতা। এছাড়া শৈশব থেকেই রেল-লাইন, রেলের সবকিছুই তার জানা। কারণ তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে রেলওয়ে কলোনীতে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বললেন- রেলের সমস্যা সর্বজন বিদিত। রেলের পরিবেশ আরো ভাল হওয়া উচিত। সময় বেশি লাগার কারণে যাত্রীরা অস্বস্তিবোধ করেন। তথাপিও সাধারণ জনগোষ্ঠী এই লাইনেই তাদের যোগাযোগ করে বেশি। রেলওয়ের সমস্যার রয়েছে নানাবিধ কারণ। ঐতিহাসিক ভাবে এটি খুবই গুরুত্ববহন করে আসছে।

ব্রিটিশরা এদেশে ট্রেন চালু করেছিল নিজেদের স্বার্থে তথাপিও সাধারণ জনগোষ্ঠী এ থেকে সুবিধা পেয়েছে অনেক। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আশির দশকে রেলওয়ে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রেল বিভাগের মধ্যে শুরু হয়েছে অধ:পতন। এটা ঠিক যে সে সময় কিছু ভাল কাজ হয়েছে, আন্ত:নগর ট্রেন চালু হয়েছে। তথাপিও দূর্নীতি, কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলা, সমন্বয়হীনতার বিষয়টি তখন থেকেই প্রকট আকার ধারণ করেছে।

বর্তমানে এই বিভাগের অবস্থা শোচনীয়। অফিসাররা ঠিকমত টিকেট চেক করে না। টিকেট কাউন্টারে হয় দূর্নীতি। টিকেটের দাম নেয় বেশি। কখনো কখনো যাত্রীদের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি টাকা না দিলে টিকেট দেয়া হয় না। বলা হয় টিকেট নাই। কিন্তু টাকা বেশি দিলেই আবার টিকেট দেয়। ফলে অধিকাংশ সময় কম্পার্টমেন্টের সিট খালি থাকে। আর এই প্রক্রিয়ার সাথে শুধু কাউন্টারের(বুকিং ক্লার্ক) লোক নয়, রেলওয়ের বাণিজ্যিক অফিসারদেরও রয়েছে যোগ সাজশ।

রেলওয়ের সংযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। ডাবল লাইন না থাকার কারণে রেলের গতি নিয়ন্ত্রণে জটিলতা বেশি তৈরী হয়। যেটি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে হয় না। কারণ সেখানে ডাবল লাইন আছে। টঙ্গী, ঢাকা, আশুগঞ্জ, আখাউড়া, চিটাগাং, চিংকে আস্তানা, ফেনী, ভৈরব পর্যন্ত Single line. এখানে যদি Double line থাকত Up down গতি বাড়ত এবং সময় কমত প্রায় ১.৩০ ঘন্টা। কিন্তু উপরের কর্মকর্তাদের কারণে এটি হবে না। কারণ তারা এটি চায় না। উপরন্তু অপচয় হয় বেশি। রেলের ষ্টেশনের সংখ্যা পর্যাপ্ত কিন্তু বগি এবং ইঞ্জিন এর সংখ্যা অপ্রতুল। কিন্তু ইঞ্জিন ও বগির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় না, ষ্টেশন নির্মাণের কাজ করা হয়। এটা করা এ কারণে যে, এটি করলে রাজনৈতিক চেলা চামুন্ডাদের আখের গোছানোর পথ তৈরী হয়। যেখানে একটি ষ্টেশন নির্মাণে বরাদ্ধ দেয়া হয় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। আর এই টাকাটা যায় ইঞ্জিনিয়ার ও নেতাদের পকেটে।

রেলওয়ের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঠিকমত সরবরাহ করা হয় না, যদিও করা হয় এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না। সার্বিকভাবে এই বিভাগের সমস্ত অব্যবস্থাপনা। রেলকে পঙ্গু করে দেওয়ার মূল কারণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক নেতারা কৌশলে এই বিভাগটি কার্যত অচল করে দেবে। এখানে শ্রমিকের অধিকার নেই, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নেই, কর্মকর্তা-পরিচালকদের দায়িত্ব কর্তব্যবোধ নেই। ফলে এটি দিন দিন তার গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে।

তবে এর সম্ভাবনা ব্যাপক। কারণ আজ যদি সত্যিকারভাবে আমরা দেশের ভাল চাই তাহলে রেলের দিকে নজর দিতে হবে। কারণ এটিতে সাধারণ পাবলিক কম খরচে যাতায়াত করতে পারে। আরামে, নিরাপদে ও কম জ্বালানী খরচে যাতায়াত করা সম্ভব। ফলে দেশের ভালোর জন্য এটি করতে হবে। আর এটি করতে হলে রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীল হতে হবে, ইঞ্জিন ও বগির সংখ্যা বাড়াতে হবে। কর্মকর্তাদের সৎ হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

যেমন বগি কম্পার্টমেন্ট সেই ব্রিটিশ আমলের, পানি পড়ে, জীর্ণ। এগুলোর পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। আনুমানিক ১০০টির মত বগির সংখ্যা বাড়াতে পারলে রেলকে স্বাভাবিকভাবে চালানো যায়। ইঞ্জিনের সংখ্যা আরও ৪০টি বাড়াতে হবে। আর এটি করলে আগামী ২০ বছর ট্রেনে আর কিছু করা লাগবে না। শুধু তাই না যাত্রীরাও আগামী ২০ বছর নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক যোগাযোগ সুবিধা পাবে।

Mixe gvb‡li Rb¨ me‡P‡q fvj evnb †Ub

mv‡R`j-kwgK

সাজেদুল সহ প্রায় ৫০ জন শ্রমিক একসাথে রাত্রিযাপন করবে স্টেশনে। ট্রেন আসবে ট্রেন আসলেই ট্রেনে চেপে যাবে জামালপুর। এরা সকলেই জামালপুর থেকে ১ মাস আগে এসেছে ঢাকাতে কাজের সন্ধানে। তারা এখন ফিরে যাবে নিজের জেলাতে। এরা প্রত্যেকেই দিন মুজুর। তারা সাধারণত এক জেলা থেকে অন্যান্য জেলাতে শ্রম বিক্রি করে বেড়ায়। এতেই তাদের জীবিকা। আর শ্রম বিক্রির জন্য তারা সহজ উপায় বলে

মনে করে ট্রেন। কারণ ট্রেনে যাতায়াত করা যায় স্বল্প খরচে। তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন সাজেদুল।

“আমি প্রায় ১০ বছর যাবৎ এভাবে বিভিন্ন জেলাতে কাজ করে রেড়ায়। সাধারণত যাতায়াত করি ট্রেনে। কারণ ট্রেনে খরচ কম। জামালপুর থেকে ঢাকা বাসে ভাড়া কাটে ১৫০ টাকা। ট্রেনে ১০০ টাকায় অনয়াসেই চলে আসতে পারি। অবশ্য সময় বেশি লাগে। ট্রেনের ভাড়া আরো কম ৮৫ টাকা। কিন্তু আমাদের কাছে থেকে ১০০ টাকা নেয়। টাকা না দিলে টিকেট দেয় না। বেশি নিলেও দেই কারণ কম খরচে যেতে পারি।

ট্রেনের কর্মচারী কর্মকর্তারা ভাল নয়, তাদের ব্যবহার খুব খারাপ। রেলে অনেক লোক যাতায়াত করে। যখনই কোন বড়লোক ট্রেনে উঠে, তখন তারা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমাদের সিটে বসায়। আমাদের টিকেট থাকলেও আমাদের উঠিয়ে দেয়। আমরা গরীব মানুষ আমাদের জোর করে সিট থেকে তুলে দেয়। ট্রেনে সব সময় দেড় (১১/২) ঘন্টা বেশি সময় লাগে। কারণ ড্রাইভার ট্রেন ছাড়ে না। সাধারণত আমরা অগ্রহায়ন থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বাড়িতে থাকি। এর পর ধান কাটা, মাটি-কাটা, ধান লাগানোর সময় হলেই লাকসাম, দাউদকান্দি, শ্রীনগর, ফরিদপুর, সিলেট, সরিষাবাড়ি কাজ করতে যাই। কাজ করে ফিরে আসি ২/৩ মাস অন্তর।

ট্রেনে চলাচল করা নিরাপদ, সকলে একসাথে যেতে পারি। তবে ট্রেনের লোকেরা খুব খারাপ ও দূর্নীতি পরায়ন। কেউ ঠিকমত দায়িত্ব পালন করে না। তবে আমাদের মত গরীব মানুষের জন্য ট্রেনের চেয়ে ভাল বাহন ব্যবস্থা আর হয় না।

†ij I‡qi Abbq‡bi wcQ‡b miKvix D`vmxbZvq `vqx
mvËvi Avn‡g` (Q›`bvg) ব্যবস্থাপক
টিকেট-সরকারী ব্যবস্থাপনা

ঢাকা-সিলেট গামী ট্রেনের মধ্যে রয়েছে বেসরকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা আবার কোনটার রয়েছে সরকারী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাপনার পার্থক্যের কারণে ট্রেনের গুণগত বা সেবার মানের ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নমাত্রা। যেমন পারাবাত যেখানে রয়েছে বেসরকারী সংস্থা প্রগতি ক্যাটারাস এবং ওবায়দুর এন্ড সন্স এর ব্যবস্থাপনা। ফলে এই ট্রেনে ক্যান্টিন রয়েছে যেখানে যাত্রীরা যাত্রাকালীন সময়ে তাদের খাবার কিংবা অন্যান্য সামগ্রী পেতে পারে সহজেই। হকারদের দৌরাত্ব কম এবং স্টপেজ সংখ্যাও কম।

অন্যদিকে জয়ন্তিকা সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যেখানে পরিবেশ নোংরা, স্টপেজ সংখ্যা বেশী এবং খাবার সুব্যবস্থা তেমন নেই। সাত্তার আহমেদ এরকম একটি সরকারী লোক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘ ৩৫ বছর। তিনি বলেন “আমাদের রেলওয়ের অনুন্নয়নের পিছনে প্রধান

কারণ সরকারী উদাসীনতা মূলত দায়ী। কারণ গত ১০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় সড়ক পথের যে উন্নয়ন হয়েছে সে পরিমানে রেলপথের উন্নয়ন হয়নি। হয়নি একারণে যে, এখন রোডে যে গাড়ীগুলো চলাচল করে সেগুলো সব সরকারী মন্ত্রী ও আমলাদের। ফলে তাদের ব্যবসার স্বার্থেই তারা রেলওয়েকে অকার্যকর করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে সাহায্য সংস্থাগুলো ঋণ দেয় তার সাথে কিছু শর্ত জুড়ে দেয় সেই সব শর্তের অধিকাংশে বলা থাকে ষ্টেশন বাড়ানোর কথা। বগি সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়না। প্রাচীন কাল থেকেই এই সেক্টরের সাথে বিমাতাসুলভ আচরন করা হয়েছে। উন্নয়নের সিকিভাগও এই সেক্টরে ব্যয় করা হয়না ।

এছাড়াও রয়েছে আন্ত:বিভাগীয় সমন্বয়ের অভাব। একটি নোট দিলে টেবিল ঘুরতে ঘুরতে লাগে ১ বছর। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া খুবই জটিল। তাছাড়া রয়েছে দূরদৃষ্টির অভাব। দেখা যাচ্ছে বগির বাইরের রঙের কাজ হয় কিন্তু বগির যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ হয়না। যেমন আগে রেল একটা কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতো এখন এটি পূর্ব পশ্চিম ভাগ করা হয়েছে। যার ফলে ব্যয়ভার বেড়ে গেছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে দূর্নীর্তি, অবৈধ ব্যবসা ও কর্মচারীদের অসৎ ও অন্যায় কাজের মাত্রাও বেড়ে গেছে। নীতি প্রণেতা ও সরকার এই রেলপথের উন্নয়নের ব্যাপারে খুবই উদাসীন।

এছাড়া বর্তমান সরকার আইন করেছে রেলওয়ে সমস্যা নিয়ে মিডিয়া এবং কারো সাথে কথা বলা যাবেনা। কথা বলতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন। তবে আমি মনে করি রেলওয়ের এই দূরাবস্থার জন্য দূর্নীতি যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী আমাদের নোংরা রাজনীতি ও রাজনীতিবিদরা।

তবে গরীব মানুষের জন্য রেল ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হয়না। ব্যবসায়ীদের জন্য ভাল মালের নিরাপত্তা থাকে, খরচ কম হয়। আমাদের সকলের এই মাধ্যমটিকে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

mô e¨e¯vcbvq †ij I‡q me‡P‡q fvj cwienb n‡Z cvi‡Zv

Rvjvj †nv‡mb

মুসলিম সুইট মিট ও হোটেল

আখাউড়া ষ্টেশন

আখাউড়া রেলস্টেশনের পাশেই মুসলিম সুইটমিট। স্টেশনের সাথে লাগানো ৩৫ বছর ধরে এই দোকানটি যাত্রীদের সেবা করে আসছে। জালাল সাহেবের দীর্ঘ সময়ের রেল স্টেশনে দোকানদারী করার নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ন জীবন। তিনি বলেন– "রেলওয়ে পথটি আগে অনেক ভাল ছিল কিন্তু দিনদিন কেমন জানি যাত্রী কমতাছে কারণ গাড়ী সময়মত আসেনা, ইঞ্জিনের সমস্যা, অনিয়মের কারণে যাত্রীরা গাড়ী ফেল করে।

দূর্নীতির কারণে টিকেটে অনিয়ম হয়। হকার উঠার নিয়ম নেই, পুলিশকে টাকা দিলেই হকাররা উঠতে পারে। ফলে বগিতে হকারে ভরে যায়। যাত্রীরা বিরক্ত হয় এবং এর পাশাপাশি ২নং ব্যাবসায়ীরা আছে তার সাথে দূর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তা এদের কারণে সরকারের প্রতি বছর ক্ষতি হয়। যেমন বাইপাস করে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। যদি ডবল লাইন করতো তাহলে সময় কমতো, যাত্রীদের ভোগান্তি কমতো, সিগন্যাল ক্রসিং এর কাজ ঠিকমতো হয়না। ফলে সময় বেশী লাগে, যাত্রীরা বিরক্ত হয়। ফলে অফিসগামী লোকজন ট্রেন ব্যবহার করতে পারেনা।

তবে রেলওয়ের পরিচালনা ভাল হলে দূর্নীতি কমাতে পারলে সময়মতো গাড়ী মেরামত ও বগির সংখ্যা বাড়াতে পারলে রেল সবচেয়ে ভাল পরিবহন হতে পারতো। কিন্তু সেটা কবে হবে জানিনা ।

‡Ub †ók‡b Avevi †`Lv †hZ û‡ovûwo- ˆn‰P

নাগর মিস্ত্রী, কাজীটুলা

নাগর মিস্ত্রী একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। কখনো চাকুরী করেন কখনো আবার ফটোগ্রাফির কাজ করেন। বোহেমিয়ান জীবন বলা যায়। তবে তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন ট্রেন ও ট্রেন লাইনেই কেটেছে। দাদা চাকুরী করতেন ট্রেনে, দাদার মৃত্যুর পর বাবা। রেল যেন তার রক্তে মাংসে মিশে থাকা অন্য এক অস্তিত্বের নাম। সেই জন্য রেলের না বলা কথার অনেক কিছুই তার জানা।

তার শৈশবে দেখেছে রেল লাইনে সারি সারি মানুষের ভীড়, ট্রেনের সময় স্টেশন ভর্তি মানুষ, হুড়োহুড়ি হৈচে। কিন্তু এখন, ট্রেনে যাত্রী নেই বললেই চলে। তার ভাষায় আগে ট্রেনে যাত্রী হত এখন হয় না। কারণ এখন ট্রেনে সময় বেশি লাগে, পরিবেশ ভাল নয়।

মেইল ট্রেনের অবস্থা খুবই খারাপ। যেমন ঢাকা থেকে সিলেটে মেইল ট্রেন ছাড়ে রাত ৯.৩০, সেই ট্রেন এসে পৌছাবে পরের দিন ৩.০০ টায়। ফলে যাত্রীরা এতে চড়ে না। এছাড়া কাউন্টারে ক্লার্ককে, নিরাপত্তা প্রহরীকে টাকা দিতে হয়। পাশাপাশি মেইল ট্রেনে কাঠের ব্যবসা ও স্মাগলিং চলে অবাধে। মূলত এই ব্যবসার কারণে মেইল ট্রেনে দেরী হয়। কারণ ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক জায়গায় ট্রেন থামাতে হয় মালামাল উঠানোর জন্য। কন্ট্রোলারকে টাকা দিয়ে ব্যবসায়ীরা ট্রেন থামিয়ে রাখে। যেখানে ইচ্চা সেখানে থামিয়ে অবৈধ মালামাল উঠায়। ফলে যাত্রীদের হয় ভোগান্তি ময়লা, নোংরা পরিবেশ। ফলে যাত্রীরা কেউ উঠতে চায় না। তবে এটা ঠিক যে এত কিছুর পরেও ট্রেনে জীবনের নিরাপত্তা আছে, খরচও কম হয়। তবে ডাবল লাইন চালু এবং কর্মকর্তাদের দূর্নীতি কমানো গেলে ট্রেনে যে সুবিধা পাওয়া যাবে আর অন্য কোন পরিবহনে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না।

‡ij l‡q weKv‡ki †¶‡Î cwZeÜKZv

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আশির দশকে রেলওয়ে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রেল বিভাগের মধ্যে শুরু হয়েছে অধ:পতন। এই অধ:পতনের প্রধানতম কারণগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, দূর্নীতি, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অভাব এবং গতিশীল করার জন্য সামগ্রীক সমন্বয়হীনতা।

`bxwZ

রেলওয়ে সরকারী একটি সেবখাত। জনসাধারণের যোগাযোগ সুবিধার জন্য এর চেয়ে ভাল বাহন আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু দূর্নীতি আষ্টেপিষ্টে জেকে বসেছে রেলওয়েতে। অধিকাংশ সময় যাত্রী টিকেট কিনতে গিয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কিনতে পারে না। তাকে কালো

বাজরীদের কাছ থেকে টিকেট সংগ্রহ করতে হয়। একাধিকবার যে যাত্রী কালোবাজারীর মুখোমুখি হয় স্বাভাবিক কারণে সে রেল যাত্রার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

রেলের স্টোরকৃত মালের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয়না। তেল-ডিজেল যা দরকার তার থেকে দু-তিনগুণ বেশি কেনা-বেচা হয়। প্রতিদিন বিভিন্ন রেল স্টেশনে চলাচলকারী রেলের ইঞ্জিন থেকে শ' শ' লিটার ডিজেল চুরি করে বিক্রি করা হচ্ছে। চুরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। রেল স্টেশন চত্বরে দোকানগুলোতে ও রেলের পরিত্যক্ত বাসায় অবৈধ বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ দেয়ার ঘটনা ঘটছে অহরহ। যা রেলওয়ের শক্তিকে সংকুচিত করে ফেলছে।

রেলের যে সম্পদ ও সম্পত্তি আছে তা রক্ষণাবেক্ষণে নেই কোন ব্যবস্থা। প্রতিনিয়ত দখল হয়ে যাচ্ছে রেলওয়ের জমি ও সম্পদ। এগুলি দিনের পর দিন স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে চলে যাচ্ছে। রেলের ক্রাপ, রেলপাত, ভাঙ্গা লোহা অবাধে পাচার হচ্ছে। একটি সংঘবদ্ধচক্র কাজগুলি করছে প্রকাশ্যে। কিন্তু দেখার কেউ নেই। অথচ এই সম্পদের চুরি ঠেকিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলে এবং এ সকল অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে রেলের কোটি কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব।

mô e¨e¯vcbvi Afve

দেশের ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে, বিশেষ করে ঢাকার উপর যে অব্যাহত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে ঢাকার আশেপাশের শহরগুলোর সাথে রেল নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা এবং তার সঠিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেক্ষেত্রে রয়েছে প্রচুর সীমাবদ্ধতা।

প্রথমতঃ যেটি বলা দরকার তা হল ঢাকার আশপাশ জুড়ে রেলওয়ের যে নেটওয়ার্ক রয়েছে তার সময় ব্যবস্থাপনা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ যাত্রী সাধারণের কখন বেশি যাতায়াত করা প্রয়োজন সে অনুযায়ী ট্রেনের সময়সূচি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেমন নারায়নগঞ্জ থেকে যে ট্রেন ঢাকায় আসে এই ট্রেনটি যদি অফিস সময়ের মধ্যে ঢাকা এসে পৌঁছায় এবং অফিস শেষ হওয়ার পরপরই যদি কোন ট্রেন নারায়নগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে তাহলে এ অঞ্চলের মানুষ ঢাকায় এসে ভীড় করবে না এবং ট্রেনও পর্যাপ্ত যাত্রী পাবে।

দেশের মধ্যে ব্রডগেজ এবং মিটার গেজ উভয় প্রকার ট্রেন ব্যবস্থা চালু আছে। পুরো উত্তরবঙ্গ (বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর) জুড়ে ব্রডগেজ রেললাইন চালু রয়েছে। কিন্তু ঢাকার সাথে সংযোগের বেলায় এটি জয়দেবপুরের পর আর আসতে পারে না। কারণ তারপর আর ব্রডগেজ লাইন নেই। সুতরাং যারা রেলে যাতায়াত করতে চান তাদেরকে হয় জয়দেবপুর গিয়ে রেলে উঠতে হয় অন্যথায় ট্রেন পরিবর্তন করে অন্য ট্রেনে উঠতে হয়। এই ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেকেই রেলে যাতায়াত করা থেকে বিরত থাকেন। অথচ জয়দেবপুর থেকে কমলাপুর এ সামন্য রাস্তাটুকু যদি ব্রডগেজ লাইন টেনে দেওয়া হয় তাহলে উত্তরবঙ্গের মানুষ সরাসরি রেলওয়েতে ঢাকায় এসে পৌঁছাতে পারেন এবং তাতে সড়কের উপর থেকে চাপ অনেক কমে যাবে। পাশাপাশি অধিকাংশ মানুষ রেলওয়েতে যাতায়াত করবে।

রেলওয়ের সীমাবদ্ধতা গুলির মধ্যে অন্যতম হল এর কামরাগুলো খুবই অপরিচ্ছন্ন থাকে, সিটগুলো ভাঙ্গা এবং সময় বেশি লাগে। সময় বেশি লাগার কারণ ট্রেনকে অনেক ঘুরে যাতায়াত করতে হয় এবং জংশনগুলোতে লাইন পরিষ্কার না থাকার কারণে দাড়িয়ে থাকতে হয়। বিশেষ করে আখাউড়া স্টেশনে গিয়ে অধিকাংশ সময় ৪৫-৫০ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। যা একজন যাত্রীর জন্য খুবই বিরক্তিকর।

ivR‰bwZK cwZeÜKZv

রাজনৈতিকভাবে কোন সময়ই যোগাযোগ ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রটিতে সূদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সরকার আসে সরকার যায় কিন্তু রেল ব্যবস্থার ক্রমশ: অবনতি হতে থাকে। একদিকে যেমন বাজেটে তেমন বরাদ্দ দেয়া হয় না। যতটুকু বরাদ্ধ দেওয়া হয় তার অধিকাংশ দুর্নীতি এবং অদুরদর্শিতার কারণে অপচয় হয়। যেমন রেলওয়ের বর্তমান অবস্থায় জরুরী প্রয়োজন বগির সংখ্যা বৃদ্ধি করা কিন্তু সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় স্টেশন নির্মাণের কাজে। এই স্টেশন নির্মাণের কাজও দূর্নীতির মাধ্যমে তাদের মনোনীত লোকদের কন্ট্রাক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৌশলী, স্থানীয় টাউটদের সমন্বয়ে ব্যাপক দূর্নীতি করা হয়।

রেলওয়ে ব্যবস্থার অনুন্নয়নের পেছনে রাজনৈতিক অর্থনীতিও দায়ী। সেটি হল এই যে, সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে সড়ক পথে চালু হয়েছে বিলাসবহুল গাড়ি। আর এই গাড়ি ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে রাজনৈতিক নেতা ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের স্বার্থ। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেরাও এই ব্যবসার সাথে জড়িত। ফলে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই কাঠামোগত ভাবে দুর্বল করে দেয়া হচ্ছে রেল ব্যবস্থা।

রেল নিয়ে কোন পরিকল্পনা করার বেলায়ও চিন্তা করা হচ্ছে মুষ্টিমেয়'র স্বার্থ। যেমন ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরির চিন্তা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে যদি ঢাকা-কুমিল্লা রেল সংযোগ লাইন তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয় তাহলে ঢাকা চট্টগ্রামের দুরত্ব কমে আসবে। তাতে করে একদিকে যেমন যানজট কমবে অন্যদিকে সবশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবে। পাশাপাশি ঢাকার উপর থেকেও চাপ কমবে। মানুষ বাইরে থেকে ঢাকায় আসবে, প্রয়োজন শেষে তারা আবার বাইরে ফিরে যাবে। কিন্তু তা না করে মাথাভারী সব চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

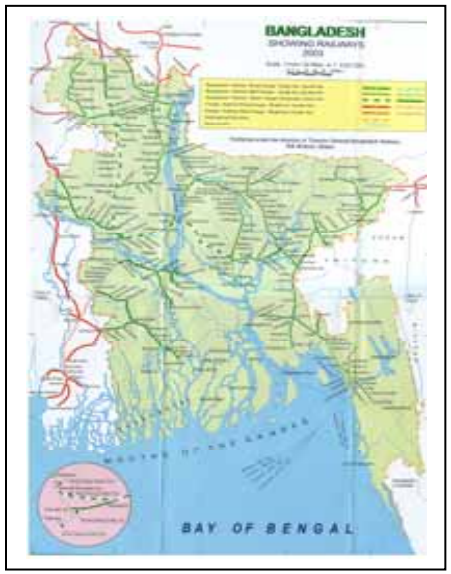

একটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন সেক্টরের উন্নয়নের জন্য কার্যকর প্রেসার গ্রুপের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু রেলওয়ের ক্ষেত্রে এই প্রেশার গ্রুপের কাজটি করে থাকে রেলশ্রমিকদের সংগঠন। বর্তমানে এই সেক্টরে কার্যকর কোনো রেলশ্রমিক সংগঠন নেই। ফলে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া ও এর উন্নয়নের জন্য কোন দাবিও উত্থাপিত হয় না। যদিবা দুই একটি সংগঠন আছে তারা মূলত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের (যখন যে সময় ক্ষমতায় থাকে) অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করে। ফলে মূল দলের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন কর্মসূচি তারা গ্রহণ করে না। সুতরাং বর্তমানের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণেও এই ক্ষেত্রটি বিকশিত হতে পারছে না।

আজকের যে বৈশ্বিক বাস্তবতা সেখানে বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য সেবাখাত হিসেবে রেলওয়েকে চিহ্নিত করা হয় এবং এর উন্নয়নের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছে প্রতিনিয়তই। সেখানে আমাদের দেশে রেল ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণ এর চিন্তাভাবনা চলছে। অথচ রেলযাত্রীর ৯৮ ভাগ স্বল্প আয়ের মানুষ। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থাটি দরিদ্র মানুষদের জীবিকার্জনের মাধ্যমও বটে। এরকম বাস্তবতায় রেলওয়েকে বেসরকারীকরণ ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে যোগাযোগ সেবা থেকে বঞ্চিত করার জন্য এক আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের আর একটি বড় সীমাবদ্ধতা হল এর অধিকাংশ যন্ত্রাংশ এখনো বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। এমনকি এই যন্ত্রাংশগুলি নষ্ট হলে মেরামতের জন্যেও বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। রেলওয়ের প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ খুবই দামী। এগুলি যদি বারবার পরিবর্তন করতে হয় বা মেরামতের জন্য বাইরের দেশের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয় কিংবা আমাদের সীমিতসংখ্যক ট্রেনের মধ্য থেকে কোন ট্রেন বন্ধ রাখতে হয় তাহলে এর বিস্তার কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ আমাদের বিশাল জনবল থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে নিজস্ব প্রযুক্তি গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা সেখানে রয়েছে ঔদাসীন্য।

সবশেষে যে বিষয়টি বলা দরকার তা হল রেলওয়ের যে আন্তঃবিভাগগুলো (যেমন ম্যাকানিক্যাল, সিভিল, ট্রাফিক, সিগনাল, ষ্টোর) রয়েছে তারমধ্যে সমন্বয়হীনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যা রেলওয়ে বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা।

evsjv‡`k †ijI‡qi weKv‡k Avï KiYxq

নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, "আধুনিক উন্নয়ন চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা।" ইতোমধ্যে পৃথিবী জুড়ে রেলওয়ে এক শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় পরিবহন মাধ্যম হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। আমাদের দেশেও এর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভবনাকে জাতীয় স্বার্থেই সত্যি করে তুলতে হবে। তারজন্যে-

- বাজেটে রেল এর জন্য বরাদ্দ বাড়ানো
- কর্ড লাইন স্থাপনের মাধ্যমে রাস্তার দুরত্ব কমানো
- দক্ষতার সাথে ট্রেনের সময় ব্যবস্থাপনা করা
- সেবার মান বৃদ্ধি করা
- সর্বোস্তরের দূর্নীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া ও টিকিট চেকের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা
- পর্যায়ক্রমে ঢাকার কাছাকাছি জেলাগুলোতে ট্রেন যোগাযোগ সম্প্রসারিত করা

- প্রযোজনীয় যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সহকারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহন।
- সড়কপথ ও রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি পরিহার করা
- রেল এর সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পরা গ্রহণ।

পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সাধারণ জনগনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাহল-

- মিটিং, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, মতবিনিময় সভা ইত্যাদির মাধ্যমে এর অপরিহার্যতার বিষয়টি সরকার ও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিগোচর করা এবং গণদাবীতে পরিণত করা
- রেলওয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জনমত সৃষ্টি
- গণমাধ্যমগুলোতে রেল ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি এবং সম্ভবনার জায়গাগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা
- রেলওয়ে যে জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও জনগণের সে বিষয়ে গণমাধ্যম এর সাহায্যে সচেতন করে তোলা
- রেললাইনের বিভিন্ন ধরনের চুরি ঠেকাতে নিরাপত্তাবাহিনীকে সহযোগীতা প্রদান

]

Dcmsnvi

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত এবং জ্বালানী সংকট নিরসনে রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন খুবই জরুরী। রেল ব্যবস্থা গুরুত্ব প্রদান করা হলে আপামর জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থা আরো সার্বজনীনতা অর্জন করবে। রেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিজাত, মুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্য কম খরচে ও সহজে বিভিন্ন জায়গায় পৌছানো সম্ভব হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক যাতায়াতের ক্ষেত্রে রেল একটি গুরুরত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে গণ্য হবে। ফলে দূর্ঘটনা জনিত মৃর্ত্যু ও পরিবেশ দূষণ কমে আসবে। রেল ব্যবস্থা উন্নত ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। গ্রাম এবং শহরের সাথে চমৎকার সমন্বয় সাধিত হবে। আমরা রেলকে পাব যোগাযোগের একটি সুন্দর মাধ্যম হিসেবে এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দময়।